Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪৭তম অন্তর্জাল সংখ্যা

১১ই ফাল্গুন, ১৪৩০/ 24.02.2024

-ঃ-সম্পাদক-ঃ-

সুনন্দন ঘোষ

-: সূচীপত্র :-

জন্মদিনে বাণী	শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
শাস্ত্র-বিচার	শ্রীঅনিলবরণ রায়
পেরিয়ার আর ব্যাক ওয়াটার	শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য
পরিবর্তন	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

Introduced by Sri Priti Kumar Ghosh in June, 1960, PARTHASARATHI Bengali Monthly Magazine: RNI 5158/ 60, published in print format for sixty years, converted to e-magazine by Sri Sunandan Ghosh, Editor & Publisher in April, 2020 during prolonged Nationwide Lockdown and now being published through the Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D/1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720.

DO NOT COPY

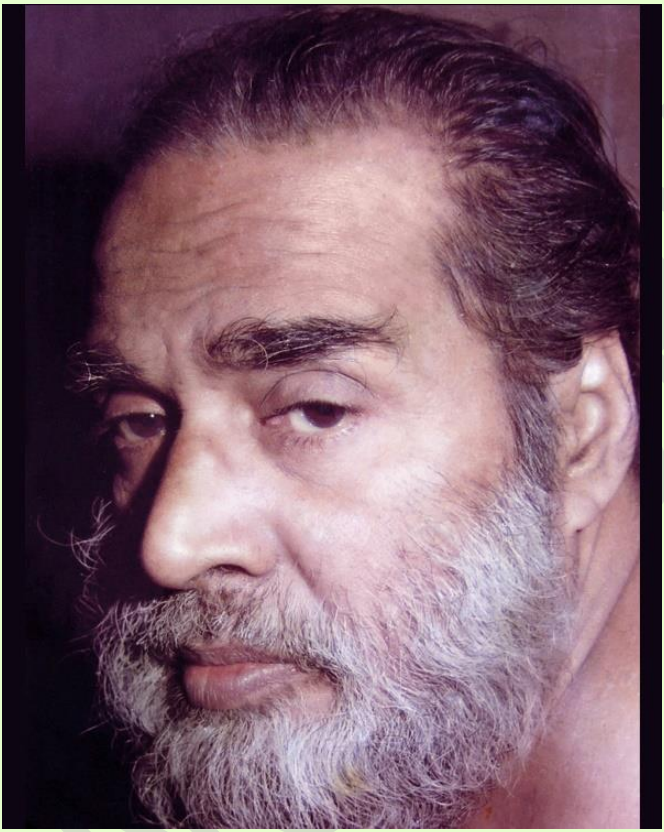

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

জন্মদিনে বাণী **শ্রীপ্রীতিকুমার**

(২৬শে ফাল্গুন, ১৩৮০ সাল)

আজকের এই শুভ দিনে আমার জীবনে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ কামনা করি। সেই সঙ্গে আমার অধ্যাত্ম ও ধর্মজীবনের পূর্ণতা সাধনে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং সহায়তাও কামনা করি।

পূর্ব নির্ধারিত বিধান অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবং তাঁর লীলায় সহায়তা করবার জন্য আমরা আগেও যেমন মিলিত হয়েছিলাম, এজন্মেও পুনরায় সম্মিলিত ও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছি।

শ্রী রামকৃষ্ণদেব বলতেন – কলমির দলের এক জায়গায় টান দিলে চারদিক হ'তে তার লতাপাতার দল জড়ো হয়।

পূর্বে আমাদের সংযোগ ছিল, তাই এজন্মেও আমরা আবার একত্রিত হয়েছি। বিগত জন্ম-জন্মান্তরে তাঁর যেটুকু কর্ম অসম্পূর্ণ ছিল, এজন্মে সেই দিব্য কর্মে পূর্ণতা আনবার জন্যই আবার আমরা মিলিত হয়েছি। এই জন্মেই আমাদের সেই কর্মের পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে।

সকলেই যে ব্যক্তিগত ভাবে সাধন-ভজন করতে পারছেন বা পারবেন, তা নয়। কিন্তু আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক দেখা-সাক্ষাৎ, মেলা-মেশা, আলাপন, আদান-প্রদান – এগুলির মাধ্যমে যে শাশ্বত স্পন্দন ও স্ফূরণ ঘটছে, তাতেই আমরা সেই পরমের নিকটবর্তী হচ্ছি অতি সহজে।

আমাদের নিরাশ হবার কোনও কারণ নেই। জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দুঃখ-ব্যথার যতই সঙ্ঘাত আসুক না কেন, তা আমাদের মনকে সাময়িক ভাবে স্পর্শ করলেও আত্মা প্রাণ ও হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করে না। এঁরা পূর্ণভাবেই সর্বদা যুক্ত আছেন তাঁর সাথে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত – যে ভাবেই হোক, তিনি আমাদের তাঁর কাছে নিয়ে চলেছেন।

আমরা তাঁরই, তিনি আমাদেরই।

জয়তু পার্থসারথি!

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শুক্লা ঘোষ**

লিখতে বসে যেটুকু মনঃসংযোগের প্রয়োজন সেটুকুও আমার আজকাল নেই। নানারকমের ঝামেলা, তার উপর নিজের মনে একটা দারুণ অবসাদ। সারাজীবন পরোপকার করলাম স্বামীর সাথে। নিজেদের সুখ-সুবিধা দেখিনি। কিন্তু এখন মনে হয় আর একটু স্বার্থপর হওয়া উচিত ছিল। তাহলে বোধহয় সংসারটাকে বাঁচাতে পারতাম। বেশিরভাগই যে যার কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন, এখন আর তাদের জীবনে আমাদের কোনও প্রয়োজন নেই। আর যাঁরা আছেন, তাঁরা একেবারেই সংস্কারে আবদ্ধ। তাই কোনও মতে একটি সুতো ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন। এখন সবই সয়ে গেছে। শাপশাপান্ত কাউকে করিনা। ঈশ্বর যদি করুণাময় হন, সময়মত তিনিই করুণা করবেন।

একমাস পার্থসারথিতে আমার লেখা বেরোয় নি। কয়েকখানি চিঠি ও টেলিফোন এসেছে। অগত্যা কলম ধরতে হয়। কিন্তু আমার দোষ হল সোজাভাবে কিছু লেখা হয় না। কথায় যেন একটু শান দেওয়া হয়ে যায়। ফলে সম্পাদক মশায়ের কলমের আঁচড় পড়ে।

আবার election এসে গেল, শ্রীপ্রীতিকুমারের কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছে। এবার বিজেপি-র প্রভাবটা নিজ চোখে দেখতে পেলেন না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি কি শ্রদ্ধা ছিল! আসলে সেটি হল তাঁর বাঙ্গালী-প্রীতি। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যখন কাশ্মীরে মারা যান, দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি, কি অদ্ভুতভাবে ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সমস্ত দলীয় নেতার বক্তব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। বেশ উৎসাহের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। খবরের কাগজের প্রতিটি লাইন তাঁর মুখস্থ ছিল। সকালে উঠেই কাগজ না পেলে তাঁর যে কি চাঞ্চল্য প্রকাশ পেতো তা লিখে বোঝানো যাবে না । তখন যদি আমরা ঠাট্টা করে কিছু বলতে

যেতাম, প্রচণ্ড ধমক লাগাতেন। কতবার যে কাগজওয়ালা বদলাতো তা গুণে রাখিনি। তবে পারলে দেরি করে কাগজ দেওয়া ভদ্রলোককে বোধহয় ফাঁসি দিয়ে দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ফাঁসি হবার chance থাকতো। কি অখণ্ড মনোযোগ ছিল লেখাপড়ায়। আমাদের পড়াশুনায় কখনও বাধা দেন নি। ওঁর সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে M.A., B.T. পাশ করা সম্ভব হত না। B.T. পড়বার সময় hostel-এ থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সন্তানকে ছেড়ে দূরে থাকা একেবারে পছন্দ করতেন না। আমার নাতনী দশদিন বয়স থেকে আমার কাছে দিনরাত থাকতো। কিন্তু সে কোনও ভাবে আঘাত পেলে বা কাঁদলে বলতেন – "দাও, দাও, ওকে শীঘ্র মায়ের কোলে দাও।"

আমি Hastings House-এ B.T. পড়তাম। বরানগর থেকে সকাল আটটা, সাড়ে আটটার মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হত। সন্তানের ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র অমনোযোগ ছিল না। তাঁর খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুর প্রতি ছিল সতর্ক দৃষ্টি। অতদূর যাতায়াত করবার পর আমার রাত্রে ক্লান্ত লাগতো। তাছাড়া কোনও পড়াশুনাই আমি সারাবছর ধরে করতে পারি না। সব রেখে দেওয়া অভ্যাস ছিল পরীক্ষার আগের রাত্রে পড়ব বলে। যদি এক দিনে দুটো Paper পরীক্ষা থাকতো আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যেতো। সারারাত জেগে পড়তে হোত। সারা পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যেত, কিন্তু আমার ঘুমোবার উপায় ছিল না। আমারও বদভ্যাস ছিল, রাত্রে একা জাগতে পারতাম না।

অগত্যা শ্রীপ্রীতিকুমারকেও জেগে থাকতে হত। একটির পর একটি সিগারেট খেতেন, কিন্তু কোনদিনও তার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। পরবর্তী জীবনে এই নিয়ে অনেক রসিকতা করেছেন। সবার কাছে মজা করে গল্প করেছেন। অনেক মহিলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন – "দাদা বৌদিকে কি ভীষণ ভালোবাসেন..." কিন্তু সে ভালোবাসা আমি বুঝিনি। আমার ওটা প্রাপ্য ছিল। আজ বুঝতে পারি সচেতনতার অভাবে কি জিনিষ হারিয়েছি। কিন্তু সেই সময়ে আবেগ-প্রবণ হতে পারিনি। ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করবার ফলে, বাড়ীতে (পিত্রালয়ে) মহিলা না

থাকবার জন্য মহিলাসুলভ আচরণটা একেবারেই রপ্ত করতে পারিনি। ফলে সেই ব্রীড়াবনতা, কোমল-স্বভাব আমার একেবারেই ছিলনা। আমার সারাটা জীবন কাটলো Left- Right করে। আমি কোথাও halt করিনি।

সিঁথি শিক্ষায়তন-এ কয়েক বছর চাকরী করে আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস হয়েছিলাম। মোটামুটি স্কুলে discipline ছিল। আমার Farewell-এ তৎকালীন হেড মিস্ট্রেস শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা বলেছিলেন – "আমরা আজ একজন দুর্দ্দান্ত শিক্ষিকাকে হারাচ্ছি। ----" এখন মনে হয় college-এ না এলেই ভালো হত। কিন্তু আমার N.C.C. সম্বন্ধে খুব আকর্ষণ ছিল। তাই স্কুল ছেড়ে দিলাম। N.C.C. থেকে বারবার বাইরে গেছি। শ্রীপ্রীতিকুমার খুব উৎসাহ দিতেন। আমি Mountaineering Training-এ যাবার সময় কি প্রচণ্ড উৎসাহ দিয়েছিলেন। তখনকার চিঠিগুলি পড়লে বোঝা যায় তাঁর এই আবেগ কি প্রবল ভাবে ওঠানামা করত। একথা ঠিক যে আমি পাহাড়ে গেলে ওঁকে একেবারে পাশে পাশে চলতে দেখেছি। কোথাও রাস্তা দুর্গম হলে দূরে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়েছেন দেখেছি। সেদিকে তাকিয়ে এগিয়ে চলেছি। এবারও September-এ মুক্তিনাথ যাবার পথে আমি খিঙ্গা নামের গ্রামটির আগে তাঁকে বারবার দেখেছি। চোখ রগড়েছি, কল্পনা মনে করেছি, কিন্তু আবার সেই পঁচিশ বছর আগে ফিরে গেছি। ওভাবেই ত তিনি আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমাকে অনেক আগেই বলেছিলেন, "..... এইজন্য তুমি ওরকম দেখতে পাও।"

খুব পরিচিত কেউ মারা গেলে আমি আগের থেকে বলে দিতাম, "আমি এরকম দেখেছি!" উনি বাড়ি ফিরে বলতেন, "অমুক ব্যক্তি মারা গেছেন। তুমি ঠিকই দেখেছ।" .....

আমার ভীষণ অসুখে ভয় ছিল। আমার অতি প্রিয়জনেরও যদি Pox হত, আমি সেই রাস্তা দিয়ে অন্তত সপ্তাহ দুয়েক হাঁটতাম না। তারপর বাড়ি এসে সমস্ত জামাকাপড় 'ডেটল জলে' না দিলে তো কিছুতেই শান্তি পেতাম না। সবচেয়ে সমস্যা হত শ্বেতী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। আসা যাওয়ার পথে আমার পাশে যদি

কোন শ্বেতী-আক্রান্তা মহিলা বসতেন, আমি বসবার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তাম। বাড়ি ফিরে শত অতিথি-অভ্যাগত উপস্থিত থাকলেও, না তাকিয়ে সোজা বাথরুমে জামাকাপড় কাচবার জন্য। শ্রীপ্রীতিকুমার মিষ্টি হেসে বলতেন, "--- নিশ্চয়ই কোন শ্বেতী রোগীর ছোঁয়া লেগেছে।" .....

বারাসতের বাড়িতে কাউকে রাখবার দরকার হয়েছিল ১৯৮৬ সালের মাঝামাঝি। তার আগে যিনি থাকতেন, তাঁর একমাত্র পুত্র মারা যাওয়াতে তিনি পুত্রবধূ ও নাতি নাতনীর সঙ্গে থাকবার জন্য বারাসতের বাড়ি ছেড়ে আসেন। সবাইকে বলা হল একজন লোকের থাকবার ব্যবস্থা করবার জন্য। শেষ পর্যন্ত শ্রী দীপক বসু তাঁর শ্যালকের সহায়তায় একজন ভদ্রমহিলার থাকবার ব্যবস্থা করেন। মা ও মেয়ে থাকবে। তাঁরা ২৩শে নভেম্বর, '৮৬ শ্রীপ্রীতিকুমারের সঙ্গে দেখা করতে আমাদের দমদমের বাড়িতে আসেন। তখন আমার রবিবারে College যেতে হত N.C.C. Class নেবার জন্য। প্রায় বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরে শুনলাম যে তাঁরা এসেছিলেন। আমি শ্রীপ্রীতিকুমারকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কেমন দেখলেন নতুন Party-দের। শ্রীপ্রীতিকুমার মুচকী হেসে ছেলেকে বললেন, "বাবু, মহিলাকে দেখলে তোমার মা তাদের বাড়িতে রাখতে চাইতো না। কি বলো ?" জেরা করে জানলাম মহিলার শ্বেতী আছে। ব্যাস! সেই আমার বারাসাতের বাড়ি যাওয়া শেষ। শ্রীপ্রীতিকুমার চলে গেলেন ২৪শে নভেম্বর। সেই মহিলাকে আজও আমার দেখা হয়নি। পরবর্তী জীবনে এই সংস্কারটা ত্যাগ করবার চেষ্টা করেছি। পারিনি। কোথাও একটা বাধা রয়ে গেছে। এই রোগে আক্রান্ত হয়ে যে বেচারী আমার এই মানসিকতার খবর রাখেন না, আবার গালে হাত দিয়ে ছাড়া কথা বলেন না, আমার মতো খুঁতখুঁতে লোকের যে তাতে কি সমস্যা হয়!

একবার এক ভদ্রমহিলার সাথে আমার পার্ক ষ্ট্রীটে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার গাল টিপে ধরে কুশল বিনিময় করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার গাল কপালে কেমন দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে উঠলো। মুখে চোখে জল দিয়েও কমেনি। আমার

সঙ্গে ছিল মীরা। সে বেচারা পার্ক ষ্ট্রীটে জল খুঁজে খুঁজে হয়রান। আমার ওরকম কেনো হোল আজও তার ব্যাখা খুঁজে পাইনি।

আমার পুত্তরের একবার শৈশবে ডিপথিরিয়া হয়েছিল। Hospital-এ দেখাতে আনার সঙ্গে সঙ্গে ভর্ত্তি করে নিয়েছিল। তখন R.G. Kar Hospital-এ ডিপথিরিয়া রোগী ভর্ত্তি করা হত। অনিমা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি আমাকেও সঙ্গে থাকতে হবে। শ্রীপ্রীতিকুমার order করলেন মা-কে ছেড়ে ছেলে hospital-এ থাকবে না। আমার ঐ hospital-এ থাকাতে প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। পৃথিবী-শুদ্ধ পিতৃকুলের উপর আমি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলাম। ১৭ দিন ছিলাম। কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছিলাম ঐসব রুগীর সঙ্গে থাকতে। কিন্তু শ্রীপ্রীতিকুমার ২৪ ঘণ্টা একজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সে গল্প আর একদিন করব। .....

– – – – – – – – – – – – –
(** রচনাকাল – মে, ১৯৯১)

শাস্ত্র-বিচার **শ্রীঅনিলবরণ রায়**

ত্যাগ ও ভোগ

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা – ঈশোপনিষৎ

গীতার শিক্ষা ত্যাগ – এ বিষয়ে কোনই মতভেদ নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই ইহা স্বীকার করেন। তবে গীতা ত্যাগ বলিতে সন্ন্যাসীদের ন্যায় বাহ্যত্যাগ বুঝে নাই। গীতার ত্যাগ ভিতরের ত্যাগ – বাসনা, কামনা, আসক্তি ত্যাগ। এইখানেই লাগিয়াছে গোলমাল। বাহিরের ত্যাগ সকলেই বুঝে, কিন্তু ভিতরের ত্যাগ কি বস্তু তাহা বুঝা

DO NOT COPY

কঠিন এবং তাহা কার্যে পরিণত করা আরও কঠিন। ভগবান গীতায় নানাভাবে এই ত্যাগের মর্ম বুঝাইয়া দিলেও অর্জুনের মত শিক্ষিত, চরিত্রবান, আদর্শ মানবও তাহা ঠিক মত বুঝিতে পারিলেন না। তাই অষ্টাদশ অধ্যায়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন-

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন।। ১৮/১

এইটিই গীতায় অর্জুনের শেষ প্রশ্ন। কিন্তু ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রশ্নের শেষ আজ পর্যন্ত হয় নাই, আজও ত্যাগ বলিতে লোকে বাহিরের ত্যাগ বা সন্ন্যাস-ই বুঝিতেছে। কিন্তু গীতা বলিয়াছে, যেখানে ভিতরের ত্যাগ আছে, সেখানে বাহিরের ত্যাগের কোনই আবশ্যকতা নাই, আর যেখানে ভিতরে ত্যাগ নাই, সেখানে বাহিরের ত্যাগের কোন মূল্যই নাই, সেটা মিথ্যাচার।

গীতার এই শিক্ষা সত্ত্বেও ভারতবাসী বাহিরের ত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আর এইটি হইয়াছে শঙ্করের ব্যাখ্যার প্রভাবে। ভারতের সব লোকই যে সেই ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া কর্মত্যাগ, সংসারত্যাগ করিয়াছে তাহা নহে। তবু ঐটিকেই তাহারা প্রকৃত অধ্যাত্ম আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, আর সংসারে থাকিয়াও নিজদিগকে অপরাধী মনে করিয়াছে, সাংসারিক জীবনকে সর্বান্তকরণের সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই - অর্জুন যেমন গীতার শিক্ষা শুনিয়া প্রথমে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাঁহার একূল ওকূল দুই কুলই যাইবে - উভয়বিভ্রষ্টঃ। ভারতবাসী প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবনও লাভ করিতে পারে নাই, আর সাংসারিক জীবনেও তাহাদের চরম অধঃপতন হইয়াছে। বাংলার এক কবি গাহিয়াছেন- ভগবান! ভগবান!! ত্যাগী বৈরাগী ভারতবর্ষ তুমি রাখ তার মান।

যে নিজের মান নিজে রক্ষা করিতে প্রচেষ্টা করে না তাহার পক্ষে ভগবানের

DO NOT COPY

সাহায্য প্রার্থনা করা বৃথা। কুরুক্ষেত্রে মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মোহগ্রস্ত অর্জুন বলিয়াছিলেন, ন যোৎস্যে - আমি যুদ্ধ করিব না। আজও চারিদিকে শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইয়াও আমাদের গভর্ণমেন্ট বলিতেছেন, 'আমরা যুদ্ধ করিব না।' 'No war pact'. গীতার শিক্ষায় অর্জুনের মোহ দূর হইয়াছিল কিন্তু ভারতবাসীর এ পর্যন্ত সে মোহ দূর হয় নাই।

এই জন্যই আমি জোর দিয়া বলিয়াছি, এই পৃথিবীকে ভোগ করাই গীতার শিক্ষা, আমি প্রমাণ স্বরূপ গীতার বাণী তুলিয়া দিয়াছি, 'উঠ অর্জুন যুদ্ধ কর, জয়ের গৌরব লাভ কর, শত্রুগণকে পরাজিত করিয়া সমৃদ্ধিশালী রাজ্য উপভোগ কর।'

জনৈক বন্ধু অভিযোগ করিয়াছেন, আমি লোককে ভোগের উপদেশ দিতেছি, কিন্তু নিজে সংসারত্যাগ কর্মত্যাগ করিয়া পন্ডিচেরীতে ত্যাগের আনন্দ উপভোগ করিতেছি, 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়' এই নীতি আমার নহে। আমার সম্বন্ধে কোন কোন দেশবাসীর যে এইরূপ ধারণা আছে, সেইটি পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছি। আমার প্রিয় বন্ধু সুভাষচন্দ্রও আমাকে ভুল বুঝিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আত্মকলহকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার 'মান্দালয়ের চিঠি'তে তিনি লিখিয়াছিলেন - 'বাঙালীর এ রকম স্বভাবের দরুনই তো বাংলাদেশে অনিলবরণের মত স্বদেশ-সেবককে হারাইল।' আত্মকলহ বাঙালীর একচেটিয়া নহে। মানুষ এখন যে অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে তাহাতে ইহা অনিবার্য। ইহা সকল দেশ, সকল জাতির মধ্যেই আছে। তাহাতে আমি কখন বিচলিত হই নাই। তাহার মধ্যে থাকিয়াই আমার যেটা কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, নিষ্ঠার সহিত করিতেছিলাম। আমি পন্ডিচেরী আসিবার পর সুভাষের সহিত আর আমার দেখা হয় নাই। তাই আমার এখানে আসার প্রকৃত কারণটা তাহাকে বলা হয় নাই। বাংলার

DO NOT COPY

কর্মীদের মধ্যে দলাদলি হওয়ায় তাঁহাকে দেশের কাজে খুবই বেগ পাইতে হইতেছিল। তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন আমি বুঝি ঐ জন্যই দেশের কাজ ছাড়িয়া আসিয়ছি। দেশের কাজে আমি স্বদেশী যুগের কর্মীদের ন্যায় গীতাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমি মোটামুটি গীতার মর্ম এক রকম বুঝিলেও উহার নিগূঢ় শিক্ষাটি যে ধরিতে পারি নাই, এটা বেশ বুঝিতাম। অথচ আমি ছিলাম দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সবই আমার খুব ভাল রকম পড়া ছিল। এই সূত্রে আমি সকলকেই আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, আধুনিক স্কুল-কলেজের বিদ্যা লইয়া গীতার মর্ম বুঝা যায় না। বেদ-উপনিষদ তো আরও দূরের কথা। এই বিদ্যা লইয়া অপরকে গীতা বুঝাইবার চেষ্টা করিলে সেটা হইবে অন্ধেন নীয়মানাঃ অন্ধাঃ। সংসারে যাঁহারা আসক্ত হইয়া রহিয়াছেন - বাসনা, কামনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা নিজেদের মনের মত করিয়াই গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবেন, যাহাতে নিজেরা যাহা করিতেছেন সেইটিই সমর্থিত হয়। আমার সৌভাগ্য আমি ত্যাগের সুযোগ পাইয়াছিলাম। ১৯২১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হইল। চাকুরী ছাড়িয়া গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান আসিল। আমি আমার পরিবারবর্গের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলাম। তাহাদের প্রতি আমার যথাসাধ্য কর্তব্য করাকেই আমি শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে করিতাম। আমার সম্মানজনক আরাম পূর্ণ মনের মত অধ্যাপনা চাকুরী ছিল। এ সব ছাড়িয়া আমি দেশের কাজে কেমন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই বুঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ আমাকে পাগল পর্যন্ত বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি পাইয়াছিলাম আমার প্রতি জগন্মাতার সাক্ষাৎ আদেশ - 'দেশের জন্য তোমাকে আত্মবলিদান দিতে হইবে!' 'You must sacrifice yourself for the Country.' - সে ডাক আর সকল ডাক, সকল কর্তব্যের উপরে। আমি তাহাতে

সাড়া না দিয়া পারি নাই, না দিলে আমার সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই যে ভগবানের আহ্বানে সর্বাপেক্ষা বড় ত্যাগ স্বীকার করিলাম তাহাতেই আমার ভিতরটা খুলিয়া গেল। সেই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীঅরবিন্দের Essays on the Gita বইখানি আমার হাতে আসিয়া পড়িল। প্রথম কয়েক অধ্যায় পড়িয়াই আমি মুগ্ধ হইলাম। মনের যুক্তি তর্ক নহে, আমার অন্তরতম আত্মা আমাকে বলিয়া দিল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন গীতার এইরূপ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে পারেন না। অপূর্ব আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল - শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহে এই পৃথিবীতে, এই ভারতবর্ষে রহিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি বহু দূরে পন্ডিচেরীতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাস করিতেছেন। সাহস করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড তাঁহাকে লিখিলাম - আমি আপনার Essays on the Gita বাংলায় অনুবাদ করিবার অনুমতি চাই। আরও একটু ইঙ্গিত দিলাম, আমি কিছু কিছু যোগ-সাধনা করিতেছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন- 'Essays on tha Gita অনুবাদ করিবার যোগ্য ব্যক্তি তুমি, উহা করিতে পার। তুমি কি যোগ সাধনা করিতেছ জানাইবে।' সে যে আমার কি আনন্দের দিন। দেশের কাজে খুবই মাতিয়াছিলাম - তারই মধ্যে এই নবীন অনুরাগ-মাখা পত্রালাপ চলিতে লাগিল। আমি দেশের কাজে যে অপূর্ব যশ লাভ করিয়াছিলাম তাহার পিছনে ছিল শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তির সাহায্য। শেষ পর্যন্ত আমি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ হস্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। সকল রকম কঠিন কাজের ভার তিনি আমার উপর দিতেন, আর সকলকে বলিতেন - অনিলবরণকে কোন কাজের ভার দিলে তাহা সিদ্ধ হইবেই।

আমি যখন যশ মান প্রতিপত্তির শিখরদেশে - তখন শ্রীঅরবিন্দ আমাকে ডাকিলেন, ঐসব কাজ ফেলিয়া দিয়া এখন তোমাকে একান্তভাবে যোগ সাধনা

করিতে হইবে। এ যে আমার পক্ষে কি কঠিন পরীক্ষা! শ্রীরাধারই ন্যায়, শ্যাম রাখি কি কূল রাখি। রাধারই ন্যায় আমিও শেষ পর্যন্ত শ্যামকেই রাখিয়াছি, কূল রাখিতে পারি নাই, তাই আজ আমার এত কলঙ্ক! এই সময়ে আমার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল - জেল হইতে শ্রীঅরবিন্দের সহিত পত্রালাপে তাহার কিছু পরিচয় আছে। পাঠকগণ 'যোগে দীক্ষা' নামক পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবেন।

শ্রীঅরবিন্দ দিব্যদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, আমরা যে আন্দোলন করিতেছিলাম অহিংস এবং সহিংস, উহার কোনটির দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না, উহার মধ্যে থাকিয়া আমি শুধু নিজেকে নষ্ট করিব - তাই তিনি আমাকে উহার মধ্য হইতে সরাইয়া লইয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা আসিবে অন্য উপায়ে। এখানে আসিয়া আমি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কখন এবং কিভাবে ভারতের স্বাধীনতা আসিবে। ১৯২৭ সালে তিনি আমাকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, ১৯৪৭ সালে তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া যায়। ইহা অপেক্ষা অধ্যাত্ম দূরদৃষ্টির বড় প্রমাণ আমার জীবনে কখন আসে নাই। মা আমাকে স্নেহভরে বলিলেন, - 'দেখ ইংরেজ যুদ্ধ করে এ দেশ জয় করে নাই, তোমরা হাতে তুলিয়া এ দেশ ইংরেজকে দিয়াছিলে, ঠিক সেইভাবেই ইংরাজ একদিন হাতে তুলিয়া এই দেশ তোমাদিগকে দিয়া যাইবে। এমন তাড়াতড়ি করিয়া দিবে যেন তাহাদের জাহাজ ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহাদের ফিরিয়া যাইতে হইবে, আর সময় নাই।' বস্তুতঃ ভারতীয় স্বাধীনতার আইন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পনেরো দিনের মধ্যে পাশ করিয়াছিল। এত তাড়াতাড়ি বিলাতে কোন আইন কখনও পাস হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, সেই শুভদিন কবে আসিবে।' তিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে জাপানের যুদ্ধ জাহাজ ভারত মহাসাগরে আসিয়াছে, তখনই বুঝিবে ভারতের স্বাধীনতার দিন নিকটবর্তী।' পাঠকগণ স্মরণ

DO NOT COPY

করিবেন, গত মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ তখন ভারত মহাসাগর হইয়া আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে আসিয়াছিল।

কংগ্রেসের নেতারা বড়াই করেন তাঁহারাই ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বড় মিথ্যা আর কিছু হইতে পারে না। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন যুদ্ধে বিব্রত ইংরাজ নির্মমভাবে দমন করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ মত কংগ্রেস নেতারা যদি ক্রীপ্‌সের প্রস্তাব গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে সুশৃঙ্খলভাবে ভারত স্বাধীনতা লাভ করিত। নেতারা গভীর অবজ্ঞার সহিত শ্রীঅরবিন্দের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করিয়া '৪২ সালের বিপ্লব আরম্ভ করিলেন। তাহার ফল হইল দেশবাসীর উপর নির্যাতন, বাংলার দুর্ভিক্ষ এবং শেষ পর্যন্ত সর্বনাশকর দেশ-বিভাগ। জহরলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতাগণকে ইংরাজ জেলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইবার পর মহাত্মা গান্ধী তাঁহাদের মুক্তির জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিকট আবেদন জানাইলেন। তাহারা দৃঢ়তার সহিত জবাব দিল, 'Quit India - ভারত ছাড়' আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার না করিলে নেতাদের কাহাকেও জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে না। মহাত্মা গান্ধী তাহাই করিলেন। জহরলাল প্রভৃতি কারাপ্রাচীরের বাহিরে আসিলেন। তাহার পর বিলাত হইতে কেবিনেট মিশন আসিয়া ভারতকে স্বাধীনতা দিলেন। সগৌরবে জহরলাল প্রধান মন্ত্রীর গদিতে উপবিষ্ট হইয়া ভারতের ভাগ্যবিধাতা হইলেন।

স্বার্থের খাতিরে ইচ্ছাপূর্বক ভারতের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাসকে বিকৃত করা হইতেছে। তাই আমাকে এতগুলি কথা বলিতে হইল। ইংরাজ জাতির মনে পরিবর্তন আসিয়াছিল, সাম্রাজ্যের নেশা তাহাদের কাটিয়াছিল। তাই তাহারা স্বেচ্ছায়

DO NOT COPY

ভারতকে মুক্তি দিয়াছে - আর তাহাদের এই মানসিক পরিবর্তনের পিছনে ছিল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার অধ্যাত্মশক্তির প্রভাব।

ত্যাগের সহিত ভোগের সমন্বয় কেমন করিয়া করা যায় তাহা কার্যতঃ দেখান হইতেছে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। মানুষের সংসার এখন যেভাবে চলিতেছে, তাহা দুঃখ ও অশান্তিতে পূর্ণ। আমি নিজে তাহা ছাড়িয়া আসিয়াছি এবং কাহাকেও আমি ঐরূপ সাংসারিক জীবন যাপন বা গ্রহণ করিতে উপদেশ দিই না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, আগে ভগবান, তাহার পর সংসার। ভগবানকে লাভ না করিয়া সংসার করিতে গেলে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হইতে হইবে। ইহা সন্ন্যাসের শিক্ষা নহে, সংসার ত্যাগের শিক্ষা নহে। ইহা হইতেছে মানুষের সংসারকে অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা। ইহাই শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণ যোগের আদর্শ, দিব্যজীবন। আমরা পন্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীমার চরণাশ্রয়ে এই দিব্যজীবনেরই সাধনা করিতেছি এবং সকলকেই এই আদর্শ গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতেছি। বর্তমান সাংসারিক জীবনে দুঃখ ও অশান্তির মূল কারণগুলি অনেক পরিমাণে দূর করা যায় যদি মানুষের মনের ও মতিগতির কিছু পরিবর্তন আনা যায় এবং বাহিরের জীবনকেও সুগঠিত করা যায়। ইহা কি প্রকারে সম্ভব তাহা কার্যতঃ দেখান হইতেছে পন্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে। দেশবিদেশ হইতে শত শত লোক এখানে আসিয়া উন্নততর মানবজীবনের প্রেরণা লইয়া যাইতেছে।

সকলের পক্ষে প্রচলিত সংসার ত্যাগ করিয়া আশ্রম-জীবন যাপন করা সম্ভব নহে। যে যেখানে আছে অধ্যাত্ম সাধনার দিকে যাহাতে কতকটা অগ্রসর হইতে পারে তাহাতে সাহায্য করিবার জন্য শ্রীমা 'শ্রীঅরবিন্দ সেবক সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম আদর্শ অনুযায়ী

জাতিগঠনমূলক কার্য করা। আমি এই সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং কিছু কিছু কাজও আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ আমি কোন দিনই দেশের কাজ, দেশের হিত চিন্তা পরিত্যাগ করি নাই। আমি রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা মন্ত্রিত্ব করিতে যাই নাই বটে, কিন্তু এখান হইতেই আমার গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী যতটুকু দেশের কাজ করা সম্ভব করিতেছি।

জাতিভেদ ও গীতার মূল শিক্ষা

অনেকেই বলিয়া থাকেন, গীতা এমন একটি শাস্ত্র, যাঁহার অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে। অনেকেই যাঁহার যেমন ইচ্ছা গীতার ব্যাখ্যা করিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। গীতার একমাত্র অর্থ আছে। সেইটি ধরিতে না পারিলে গীতার শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। গীতার বিভিন্ন স্থানে এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে, ঠিক মত ধরিতে না পারিলে মনে হয় সে-সব পরস্পর-বিরোধী। যাঁহার যে কথাটি পছন্দ সে সেইটি গ্রহণ করে এবং বলে এইটিই গীতার শিক্ষা। অর্জুনের মনে হইয়াছিল গীতার গুরু শ্রীকৃষ্ণ যেন কখনও একরকম, কখনও আর একরকম কথা বলিতেছেন। তাই তিনি পুনঃ পুনঃ একটি শিক্ষা স্পষ্ট করিয়া জানিতে চাহিলেন যাহা দ্বারা তিনি শ্রেয়লাভ করিতে পারেন (৩/১, ২; ৫/১)। গীতায় নিশ্চিতভাবে সেই একটি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তবে সে শিক্ষা অতিশয় গভীর ও নিগূঢ়, উত্তমম্ রহস্যম্। তাই নানা দিক দিয়া ক্রমশঃ তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কোথাও একটা কথা সংক্ষেপে ইঙ্গিত করিয়া পরে বিশদ করা হইয়াছে, কোথাও প্রথমে যাহা বলা হইয়াছে পরে তাহা সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হইয়াছে। গুরু শিষ্যকে এইভাবেই শিক্ষা দেন। তাহার বুঝিবার ক্ষমতা অনুযায়ী একই কথা নানাভাবে বলিতে হয়। তাই যাঁহারা সাধারণ বিদ্যা লইয়া গীতা পড়িতে যান তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। গীতাই

বলিয়াছে - তর্কের দ্বারা নহে, শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্বদর্শী গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। বেদাদি শাস্ত্রে পরম জ্ঞান আছে, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর সাহায্য বিনা তাহা বুঝা যায় না। এইজন্যই শাস্ত্রপাঠে লোকের মন বিভ্রান্ত হয় - শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্যগণ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। নতুবা সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীর মনের উপর তাঁহারা এত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন না। অধ্যাত্ম সাধনা দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মের, আত্মার উপলব্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে উপলব্ধি সামগ্রিক ছিল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শঙ্কর ব্রহ্মের নির্গুণ, নিরাকার, নিষ্ক্রিয় স্বরূপটিই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি রূপটি তিনি দেখিতে পান নাই। তাই নিজের মনের মত গীতার ব্যাখ্যা করিয়া তিনি নিষ্ক্রিয়তা ও সন্ন্যাসের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। সিদ্ধপুরুষেরাই যে ভগবানকে সমগ্রভাবে জানিতে পারেন না, গীতাতেই তাহা উক্ত হইয়াছে-

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।। ৭/৩

গীতার মত গভীর অধ্যাত্ম শাস্ত্র সমগ্রভাবে বুঝিবার চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই। গীতার মূল শিক্ষাটি যদি ধরিতে পারি এবং নিজেদের অধ্যাত্ম অনুভূতিতে তাহার প্রমাণ পাই এবং সেই শিক্ষা আমাদের অধ্যাত্ম জীবন গঠনে প্রয়োগ করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের গীতাপাঠ সার্থক হইবে। পরমযোগী শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যাতে আমরা এই মূল শিক্ষারই সন্ধান পাই।

গীতার ব্যাখ্যা করিয়া যে-ভাবে প্রচলিত জাতিভেদের সমর্থন করা হইতেছে, গীতার কুব্যাখ্যার ইহা প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বর্তমানে এক শ্রেণীর হিন্দু পণ্ডিতগণ যে রব তুলিয়াছেন, জাতিভেদ সনাতন ধর্মের অঙ্গ, ইহা উঠিয়া গেলে সমাজ ধ্বংস হইবে-

ঠিক এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া অর্জুন তাঁহার ভগবদ্ নির্দিষ্ট কর্তব্য কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেছিলেন।

'উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ - দিব্যগুরু শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের এই যুক্তি অগ্রাহ্য করেন নাই, বলিয়াছেন অর্জুনের ঐসব যুক্তি বিষাদগ্রস্ত মোহাচ্ছন্ন মনের যুক্তি, কশ্মলং ক্লৈব্যং। অর্জুনও স্বীকার করিলেন যে, তিনি ধর্মসংমূঢ়চেতা- ধর্মাধর্ম জ্ঞান তাঁহার লোপ পাইয়াছে। তিনি শিষ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে প্রকৃত শাশ্বত সনাতন ধর্ম শিক্ষা দিলেন - তাহাই গীতার শিক্ষা। অর্জুন কৃষ্ণকেই শাশ্বত ধর্মগোপ্তা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

গীতার যুগেই প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথা (অর্থাৎ গুণ অনুসারে সামাজিক শ্রেণী বিভাগে) জাতিভেদ (অর্থাৎ জন্ম অনুসারে শ্রেণীবিভাগে) পরিণত হইতেছিল।

মহাভারতের নানাস্থানে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে। বনপর্বে যুধিষ্ঠির ও নহুষের সংবাদে যুধিষ্ঠির সত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণের গুণ উল্লেখ করিয়া বলিলেন- 'যে শূদ্রে এই সকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নহে, এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহে।' এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে ব্রাহ্মণের বংশে জন্মাইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ হয় না - অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গুণে ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার ভেদ করা হইল। প্রথমটি হইতেছে জাতিভেদ এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য। সমাজের প্রয়োজন অনুসারেই এককালে জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছিল। বৃত্তি অনুসারে শ্রেণী বিভাগ করিলে সমাজে প্রতিযোগিতা কম হয়, আর জন্ম অনুসারে বৃত্তি নির্ধারণ করিলে বৃত্তি শিক্ষার সুবিধা হয়। তাই এককালে জাতিভেদ কল্যাণকর ছিল। কিন্তু এখন আর জাতিভেদের দ্বারা সেইসব প্রয়োজন সিদ্ধ হইতেছে না। ইহা শুধু ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছে। অতএব

DO NOT COPY

প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্যের দোহাই দিয়া বর্তমান জাতিভেদকে সমর্থন করা চলে না। এখনও যে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি, এমন কি সাধু-সন্তও জাতিভেদ সমর্থন করিতেছেন তাহাতে শুধু ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কালের বশে হিন্দুদের মনে এই সংস্কারটি অতিশয় দৃঢ়মূল হইয়াছে। এইটি একটি কুসংস্কার ইহা জানিয়া বুঝিয়াও লোকে ইহা ছাড়িতে পারিতেছে না, নানারূপ যুক্তি তর্কের দ্বারা অর্জুনের ন্যায় ইহাকে সমর্থন করিতেছে। কিন্তু সহজেই দেখান যায় যে, ঐসব যুক্তি অসার।

হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল (স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষের সহকর্মী) শ্রীযুক্ত তারাকিশোর শর্মা যিনি পরে সন্তদাস বাবাজী নামে বৃন্দাবনে মোহন্ত হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ব্রহ্মবাদী ঋষি গ্রন্থে লিখিয়াছেন - 'এক্ষণে যে কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ গ্রাসাচ্ছাদন লাভ করিবার নিমিত্ত সকল শ্রেণীর লোকই সমভাবে ব্যগ্র হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে জাতি বিভাগও এক্ষণে কেবল নামে মাত্র পরিণত হইয়াছে। এখনকার ভারতবর্ষীয় জাতি বিভাগ অবৈজ্ঞানিক এবং ইহাতে বর্তমান কালে নানাপ্রকার দোষ দৃষ্ট হইতেছে।' বর্তমানে দৃঢ়মূল সংস্কারের বশে যাঁহারা জাতিভেদ বর্জন করিবার কথা কল্পনাও করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা বলিতেছেন জাতিভেদের বর্তমান দোষগুলি দূর করিয়া ইহার সংস্কার করা হউক। কিন্তু মৃতদেহের একমাত্র সংস্কার যেমন সৎকার, জাতিভেদের পক্ষেও তাহাই প্রয়োজন। কোনরূপ মায়া-মমতা না করিয়া সম্পূর্ণভাবে উহাকে বিসর্জন দিয়া অধ্যাত্ম সত্যের ভিত্তিতে সমাজকে নূতন করিয়া গঠন করা - গীতা সেই অধ্যাত্ম সত্যেরই সন্ধান দিয়াছে। বস্তুতঃ সেই সত্য অবলম্বন করিয়াই প্রাচীন ভারতে সমাজকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণে বিভাগ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। সেই বিভাগ সম্পূর্ণভাবে কখনও সফল হইয়াছিল বলিয়া কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। ভাগবত ও অন্যান্য

DO NOT COPY

পুরাণ হইতে যে তথ্য পাওয়া যায় তাহাতে প্রাচীন কালে কোন সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগের প্রমাণ মিলে না। কিন্তু যে অধ্যাত্ম-সত্যকে ধরিয়া বর্ণবিভাগের চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা চিরন্তন সত্য। তাহা হইতেছে প্রত্যেক মানুষের স্বভাবজাত গুণ অনুসারে তাহার কর্ম নির্দিষ্ট করা কর্তব্য। গুণকর্মবিভাগশঃ বলিতে গীতা ইহাই বুঝিয়াছে। যুধিষ্ঠিরও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন। জনৈক সমালোচক বলিয়াছেন- যুধিষ্ঠিরের স্বভাবজাত গুণে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যুদ্ধ ও রাজকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং এইভাবে তিনি মুখে যাহা বলুন কার্যতঃ জাতিভেদেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বর্ণ-বিভাগের তত্ত্ব ঠিকমত বুঝিলে এইরূপ আপত্তি সম্ভব হইত না। যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, সংযমী, ধার্মিক ছিলেন। এ গুণগুলি শুধু ব্রাহ্মণেরই নহে, ক্ষত্রিয়েরও এইসব গুণ। অর্জুনের মধ্যেও এইসব গুণ ছিল। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় - এই দুইটি হইতেছে উচ্চবর্ণ। ইহাদের মধ্যে আবার ভেদ হইতেছে, ব্রাহ্মণের মধ্যে সত্ত্ব অধিক, আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তমঃ অধিক। বর্তমানে আর সেই প্রাচীন চারি বর্ণ বিভাগের theoretical (কাল্পনিক) আদর্শ অনুসরণের কোনই উপযোগিতা নাই। জাতিভেদের দ্বারা সকলেরই কোনরকমে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করাও আধুনিক আদর্শ পথে - আধুনিক আদর্শ হইতেছে সম্পূর্ণভাবে দারিদ্র্য দূর করিয়া সকলের পক্ষে প্রাচুর্য্যের ব্যবস্থা করা। প্রাচীনকালে ইহা সম্ভব ছিল না, বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রগতিতে ইহা খুবই সম্ভব হইয়াছে। এখন চাই অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা মানুষের মতিগতির পরিবর্তন। গীতা তাহারই সন্ধান দিয়াছে।

গীতা কোথাও শাস্ত্র অমান্য করিতে বলে নাই, শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া আরও ঊর্ধ্বে উঠিতে বলিয়াছে-

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। ২/৪৫

কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশে না চলিয়া কোন নীতি বা আদর্শ মানিয়া চলিতে হইবে, ইহাই মানুষের পক্ষে প্রাথমিক সাধনা। ইহার দ্বারাই সে পশুত্বের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মানবত্ব ছাড়িয়া দেবত্বের মধ্যে উঠিতে হইলে সকল শ্রুত ও শ্রোতব্য শাস্ত্র ছাড়িয়া একমাত্র ভগবানকে অবলম্বন করিতে হয়। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য। বিশ্বকবির একটি গানে এই সাধনার পরম্পরা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে-

আমায় ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় বলে
পদে পদে পথ ভুলি হে।
নানা কথার ছলে নানা মুনি বলে সংশয়
তাই দুলি হে।
তোমার কাছে যাব এই ছিল সাধ
তোমার বাণী শুনে ঘুচবে প্রমাদ
শত জনে আমার সাধে শত বাদ
কত জনার কত বুলি হে।

পুনর্মুদ্রিত

"মহাসাম্রাজ্য দেশ-বিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই।তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হয়।"

--- আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু

DO NOT COPY

পেরিয়ার আর ব্যাক ওয়াটার **শ্রী অরূপ কুমার ভট্টাচার্য**

কেরালা রাজ্যে মুন্নারের মজা লুটে নেওয়ার পর দেখতেই হবে পেরিয়ার আর কোচি, কোল্লাম অথবা আল্লাপ্পুঝার ব্যাক ওয়াটার। 'পেরি' অর্থ বড় এবং 'আর' মানে নদী। তবে পেরিয়ার বলতে শুধু বড় নদীর জলে তৈরি করা লেককেই নয়, এখানকার সমগ্র অরণ্যভূমিকেই বোঝানো হয়েছে। সেই অরণ্য ভূমির হোটেল, অফিস আর বাসের সংযোগস্থল থেক্কাডি হলেও ৩০০০ ফুট উচ্চতার মশলাদার শহর কুমিলি তার সদর দরজা। মুন্নার থেকে কুমিলি পৌঁছবার পথে চার কিলোমিটার আগেই পরিচয় হয়েছিল স্পাইসরুট মশলাবাগানের সাথে। আগে পরে তেমন বাগান অবশ্য আরো ছিল, কিন্তু বিষ্ণুর তালে তাল মিলিয়ে গাড়ি থেমেছিল তাদের পছন্দের বাগানেই। আমাদেরও সুবিধা হলো। ১০০ টাকার প্রবেশমূল্যটা বিষ্ণুর সৌজন্যে হয়ে গেলো মাত্রই ৫০। এলাচ, দারুচিনি, গোলমরিচকে গাছের ডালে অথবা ছালে জড়িয়ে দেখার অভিজ্ঞতা তো বটেই, তার সাথে মশলাবাগানের পরিবেশ আর গন্ধও বোধহয় আমার ভ্রমণস্মৃতিতে জড়িয়ে গেল। আর রয়েছে আয়ুর্বেদিক তেল, জেল, ক্রিম, মেডিসিন আর হাজারো প্রোডাক্টস অফ স্পাইসরুট কেনার সুযোগ। তবে পরে দেখেছি কুমিলির দোকানে এ'সবেরই দাম এখানকার চেয়ে অনেক শস্তা।

কুমিলিতে আমাদের হোটেল 'ইদুক্কি ক্যাসেল' একেবারে থেক্কাডি রোডের ওপর। সকাল আটটার মধ্যে জলখাবার খাওয়া হতেই বিষ্ণুর গাড়ি আমাদের নিয়ে এল কুমিলির টার্মিনাসে যেখান থেকে টাইগার রিজার্ভের ছোট ছোট বাস টিকিটধারীদের নিয়ে চলেছে পেরিয়ারের লঞ্চঘাটে। আমাদের অনলাইন টিকিট করাই ছিল। সেটা টিকিট কাউন্টারে দেখাতেই মিলে গেল বাসে ওঠার ছাড়পত্র। পেরিয়ারের লঞ্চঘাটে আবার সে টিকিট দাখিল করতে পেয়ে গেলাম লঞ্চ আর সিট

DO NOT COPY

নম্বরটাও। ইতিমধ্যে জেটিতে আমাদের নির্দিষ্ট লঞ্চ এসে ভিড়েছে। উৎসাহী পর্যটকেরা সিটের খোঁজে যে গোলমাল পাকাতে পারতো, তাকে চমৎকার ভাবে কন্ট্রোল করে যার যেথা স্থানে বসিয়ে দিল বনদপ্তরের কর্মীরা। লাইফ জ্যাকেটটা গায়ে উঠতেই মনে এল আন্দামান বেড়াতে গিয়ে বারাটাং-এর স্মৃতি। ঘরের কাছে মুকুটমণিপুরের কংসাবতীসহ অনেক লেক বিহারেই হয়ত লাইফ জ্যাকেট গায়ে গলাতে হয়েছে কিন্তু বারাটাংয়েই যে সেটা ছিল প্রথম।

শুরু হল আমাদের জলে ভেসে চলা। ভ্রমণ স্লট সকাল ৯-৩০ থেকে ১১টা। জেটি থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে কেরলের বৃহত্তম নদী পেরিয়ারে ১৮৯৫ সালে কৃষি ও জলবিদ্যুৎ তৈরির জন্য যে ২৬ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত ৪৬ মিটার গভীর জলের হ্রদ তৈরি করা হয়, তাকেই পরবর্তী কালে ৫৫ বর্গ কিলো মিটারের স্যাংচুয়ারী গড়ে তোলেন ত্রিবাংকুরের মহারাজা। ১৮৯৯তে অভয়ারণ্য মর্যাদা লাভ করার পর ১৯৩৪-এ আয়তনে বেড়ে তার নাম হয় নেলিয়ামপ্যাথি স্যাংচুয়ারি। ১৯৫০ সালে আয়তন ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার হওয়ার পর নামেরও বদল হয় ‘পেরিয়ার ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি’। শেষে ১৯৭৯তে টাইগার রিজার্ভের শিরোপা চাপে পেরিয়ারের শিরে। তথ্যের পুস্তিকা বলছে জঙ্গলের ৩৫০ বর্গ কিলোমিটার কোর এরিয়ায় নাকি চল্লিশ বাঘের বাস। তাদের দেখা না গেলেও চোখে পড়তে পারে মাক্না হাতীর দল। আর রয়েছে কচ্ছপ, সম্বর, বাইসন, বন্য মহিষ, বুনো শুয়োর আর কুকুরের পাল। বাস্তবে মানুষের হট্টগোল আর লঞ্চের আওয়াজে তারা লুকিয়ে থাকে গভীর বনের ভিতরে। আমরা তাদের দেখতে পাই বা না পাই, তারা আমাদের ঠিকই দেখে জঙ্গলের আড়াল থেকে আর অপেক্ষা করে কখন এ আপদেরা বিদায় নেবে। সকাল ৭-৩০ থেকে শুরু হয়ে দফায় দফায় দেড় ঘন্টার স্লট শেষ হতে বিকেল পাঁচটা গড়িয়ে যায়। তার আগে জলের ধারে আসতে তাদের বয়েই

DO NOT COPY

গেছে। আমার কথা বলতে পারি – জন্তু নয়, তাদের বাসভূমি দেখতেই মুখ্যতঃ এসেছিলাম পেরিয়ার লেকের জলবিহারে। লঞ্চের উপর তলায় বসে দেখেছি নীল আকাশের নীচে স্বচ্ছ হ্রদের জল, দু'দিকে ঘন বুনট কালচে সবুজ বন, আর লতা, গুল্ম, অর্কিড ঘিরে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়শ্রেণী। সে সৌন্দর্যের স্বাদ নিতে গিয়ে অবশ্য দেখতে পেয়েছি কাঠঠোকরা, মাছরাঙ্গা ছাড়াও বাইসন, বুনো মোষ আর দু চারটে হরিণ। ফেরার বেলায় আবার বাসে লাইন। তবে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না, বাস যে আসছে মুহুর্মুহু। চাইলে নামতে পারেন টাইগার রিজার্ভের গেটে অথবা একেবারে বাসের টার্মিনাসে। আমাদের হোটেল যেহেতু থেক্কাডি-কুমিলি রোডের উপরেই, অনুরোধ করতেই নামিয়ে দিল একেবারে হোটেলের দরজায়।

বিকেলে কুমিলি-থেক্কাডি বাইপাস হয়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছতেই মন পিছিয়ে গেছিল ৪১ বছর আগে। ১৯৮২তে এক চার্টার্ড ফার্মের হাত ধরে যে ভান্দিপেরিয়ারের কফিবাগানে অডিট করতে এসেছিলাম, এখান থেকে পেরিয়ার নদীর পাশে সেই পাহাড়ি গ্রামে যাওয়ার বাস ছাড়ছে যে! নস্টালজিয়া হবে না?

ফিরতি পথে 'মা-মেরী'র চোখ টানা মর্মরমূর্তির রাস্তায় অজস্র মশলার দোকান। আগেই বলেছি গুণে-মানে এক হলেও দাম বাগানের চেয়ে অনেকটাই কম। আর রয়েছে চকোলেট। এখানকার ঘরে ঘরে তৈরি হয় যে চকোলেট। মুন্নারে চেখে দেখেছি। অনবদ্য!

পরদিন সকাল আটটায় ১৩৭ কিলোমিটার পশ্চিমে ব্যাক ওয়াটারের অন্যতম শহর আল্লাপুঝার উদ্দেশ্যে চলার শুরু হতেই চোখের সামনে ভাসতে থাকে গত সন্ধ্যার কথাকলি আর মার্শাল আর্টের দৃশ্য। মার্শাল আর্ট নিয়ে বলার কিছু নেই। ২০০ টাকার টিকিটে রোমাঞ্চের রসদ যথেষ্টই আছে ; কিন্তু ২০০ টাকার টিকিট কেটে যে কথাকলি নাচ আমরা দেখেছি, তেমনটা হয়তো এই কলকাতাতেই

আপনারা দেখেছেন, কিন্তু কেরালা পর্যটনের প্রচারের গুণে রাজ্যের বহু শহরের কথাকলি আজ ভারতবিখ্যাত। কোট্টায়াম-কুমিলি রাজ্য সড়ক ধরে আলেপ্পি পৌঁছবার পথে চল্লিশ কিলোমিটার যেতে না যেতেই ভালঞ্জাঙ্গানাম জলপ্রপাত। ইদুক্কি জেলার কুট্টিকনামে একঝাঁপে ৭৫ ফুট নেমে আসা এই প্রপাত যে শুধু দৃষ্টিনন্দন তাই নয়, লং ড্রাইভে আসা পর্যটকদের এটা চা-পানের বিরতি স্থানও বটে। আমাদের আজ শুধু ব্যাক ওয়াটারে নৌকাবিহার নয়, স্বল্প সময়ে দেখে নিতে হবে আলেপ্পি বীচটাও। তাই দশ মিনিটেই ভালঞ্জাঙ্গানামে ফটো সেশন সেরে এগিয়ে চলি বাকী ৯৭ কিলোমিটার পথকে পিছনে ফেলতে। এরপর একে একে কারুকাচল, চাঙ্গানাসেরি পার হয়ে একটা খালের জলে হাউস বোট দেখেই মনে হয়েছিল বোধহয় আলেপ্পি পৌঁছে গেছি। তখন কি জানি আল্লাপুঝার আগে পরে যত গ্রাম সবাইকে বেঁধেছে এই খালের জাল? আসছি সে কথায়। শেষ ঘড়ির কাঁটা যখন একটা ছুঁই ছুঁই, পৌঁছে গেলাম আল্লাপুজার ডিসট্রিক্ট কোর্ট রোডের পাদিপুরা রেসিডেন্সিতে।

আলেপ্পির প্রধান দুই আকর্ষণ আরব সাগর সৈকতে ১৫০ বছরেরও বেশি পুরানো ঘাট সহ বালি শিল্প উৎসব এবং অবশ্যই ভেম্বনাদ হ্রদের জলে নৌকা বিহার, তা' সে হাউসবোট, স্পিডবোট অথবা সরকারি লঞ্চে – যাই হোক না কেন। সরকারি লঞ্চে খালের জলে হারিয়ে যেতে খরচ বেশি নয়, পক্ষান্তরে হাউসবোটে দিন-রাত থাকা খাওয়া আর ঘোরার আনন্দ সব চাইতে বেশি হলেও তা' পেতে মানিব্যাগকে কাঁদাতে হয়। বিষ্ণুর মধ্যপন্থা আমাদের পক্ষে মন্দ ছিল না। ২৯ জনের দলটার জন্য ছোট একটা লঞ্চ জুটিয়েছিল মাথাপিছু ৫৫০ টাকার বিনিময়ে। ব্যাকওয়াটার দেখাতে কতদূর নিয়ে যাবে সেটা বুঝতে না পারলেও ভ্রমণ সময়টা আমরা চাইলে দুই থেকে চার ঘন্টা যা খুশি হতে পারতো। তবে আজ সন্ধ্যাতেই আবার আলেপ্পি বীচের ডাক, যেমন খুশি যাওয়ার সময় আমাদের কোথায়?

আলেপ্পির যে ঘাট থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়লো তাতে কেরালার ব্যাক ওয়াটার সম্পর্কে কল্পনার ফানুসটা চুপসে যেতে বাধ্য। কচুরিপানায় ভরা অপরিসর খালটা নোংরামিতে বাগজোলা খালকেও হারিয়ে দেবে। কিন্তু ক্রমে যখন লঞ্চ এসে পড়ে ভেম্বনাদের অকূল জলের মাঝখানে তখনই মন বলে ওঠে 'এর জন্যই তো এখানে আসা'! আলয়ম অর্থ ঘর আর পূঝা মানে নদী। খাল- নদীর শহর আলেপ্পি তথা আল্লাপুঝা যেন প্রাচ্যের ভেনিস। ৬৫টি খাল ১২টি গ্রামের মধ্য দিয়ে যেভাবে মাকড়সার জাল বুনেছে, তাতে একাকী নৌবিহারে জলের জালে ফেঁসে গেলে বলার কিছু নেই। সব খালেরই শুরু কিম্বা শেষ এই ভেম্বনাদে। কেরালার বৃহত্তম এই লেক কোল্লাম, আলেপ্পি আর কোচি ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত মিলে গেছে আরব সাগরের জলে। কোচি হ্রদের সাথে আরব সাগরের মেলামেশার স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখা – সে এক অপূর্ব প্রাপ্তি।

ভেম্বনাদের জলে লঞ্চবিহারের সময় কাছে চলে আসে স্পিডবোটের দল। স্পিডের চমকানি দেখিয়ে দশ কিলোমিটার অ্যাডভেঞ্চারাস লেকবিহারে প্ররোচিত করে ২৫০ থেকে ৩০০ টাকার বিনিময়ে। কম বয়সে ভেসে যেতাম নিশ্চিত, এখন স্পিড বোটে চাপি কি চাপিনা, ভাবনাটাই উড়িয়ে দিলেন সহধর্মিনী। তাঁকে ফেলে আর অ্যাডভেঞ্চারে যাই কি করে?

আলেপ্পি জেলার ভেম্বনাদ হ্রদ যেমন কুট্টনাড়ে হয়েছে পুণ্নমদ, কোচিতে তাই আবার কোচি হ্রদ। নাম যাই হোক না কেনো ধাম সেই সাগরের জলে। লেকের মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। তার কোনোটায় যেমন জমা হয় শীতের পরিযায়ী পাখি, কোনোটায় বা রয়েছে চা অথবা কফি পানের আমন্ত্রণ। এমনই এক দ্বীপের কফির উষ্ণতা আজ নৌকাবিহারে শেষ পর্যায়কে ভিন্ন স্বাদ এনে দিল।

DO NOT COPY

আলেপ্পিতে যেটা দেখা হলো না, তা' পেরিয়ার নদীর সাথে পাল্লা দেওয়া পম্পা। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় শনিবার এই পম্পানদীতে যে স্নেকবোট রেস হয় তা নাকি সমস্ত শহরকে মাতিয়ে তোলে। বিষাক্ত সাপের ফণার সাজে কেরলের একশো দাঁড়ের ট্রাডিশনাল নৌকা চুন্দন ভাল্লাম যখন নেহরু ট্রফি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্লাপ স্লাপ আওয়াজে জল কেটে এগিয়ে চলে সে সত্যিই এক দেখার মত দৃশ্য। আমরা আর সে মজায় মজবো কি ভাবে? আজ যে মাত্রই ডিসেম্বরের পয়লা!

ভেম্বনাদে নৌকাবিহার শেষ হতেই সূর্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বিষ্ণুবাসের দৌড় শুরু আলেপ্পি বীচের দিকে। আমরা আগে বীচে পৌঁছবো না সূর্য আগে ডুববে! এই প্রতিযোগিতায় কিছু সময়ের জন্য হলেও আমরাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেলাম। ভাগ্যিস! না হোলে ডুবুডুবু সূর্যটাকে শেষ পর্যন্ত আরব সাগরের জলে লুকিয়ে পড়ার দৃশ্য মন অথবা মোবাইলে তুলে রাখার সুযোগ আমরা পেতাম না। ক্রমশঃ আলেপ্পি বীচে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, যদিও আলোর প্রাচুর্যে সেখানে অন্ধকার নেমে আসে না। বীচের কফিতে শেষ চুমুক দেওয়ার সময় মনে সব পেয়েছি না হলেও অনেক পাওয়ার আনন্দ। আগামী সকালে কোভালম রওনা হওয়ার আগে কেরালার বেশিরভাগ ভালোটাই আমাদের দেখা হয়ে গেছে।

আলেপ্পি-তে সূর্যাস্ত আলোকচিত্রঃ লেখক

DO NOT COPY

হাউস বোট, আলেপ্পি

ভালঞ্ചাঙ্গানাম জলপ্রপাত।

পরিবর্তন **সুনন্দন ঘোষ**

দশ হাজার বছর আগেও মরেছে মানুষ নৃশংস আঘাতে,
মৃগয়ার জন্য ভূখণ্ড দখলের যুদ্ধে।
কেনিয়ার সেই নাটারুক গঙ্গাপাড়ের বঙ্গ ভূমির সাথে
আজ একাত্ম হয়ে যাচ্ছে কালের বিবর্তনে ...
হাতে হাত রেখে মঞ্চ ভাগ করে নিচ্ছে
মরিচঝাঁপি আর সন্দেশখালির প্রকৌশলীরা।

এইটুকু তো জীবন আমাদের।
শুরু দেখলে শেষ দেখা হয়না,
শেষ দেখলেও শুরুটা অজানা থাকে।
কিন্তু এই গল্পের শেষ জানে সবাই -----

পরিবর্তনের পরিবর্তন ।

DO NOT COPY